প্রাথমিক শিক্ষার মূল কাজ শিশুকে সামাজিকীকরণ : শিক্ষা উপদেষ্টা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ২১:২০

শেয়ার

অ +

অ -

'গণ-অভ্যুত্থান উত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি' শীর্ষক সেমিনারে কথা বলছেন উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। ছবি : কালের কণ্ঠ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, ‘আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মূল কাজ হলো, একটা শিশুকে সামাজিকীকরণ করা। এটাই হলো প্রাথমিক শিক্ষার মূল কাজ। শিশুকে সামাজিকীকরণ করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।’

মঙ্গলবার (ডিসেম্বর) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব দর্শন দিবস উপলক্ষ্যে দর্শন বিভাগে অনুষ্ঠিত 'গণ-অভ্যুত্থান উত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি' শীর্ষক এক বিশেষ সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ‘সভ্যতার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে লিপি। লিপি এমন একটি আবিষ্কার যেটা মানুষের ইতিহাসকে পালটে দিয়েছে। আগে মানুষের অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণিত হতো ব্যক্তিতে ব্যক্তির মারফত এবং এটার সীমানা ছিল মানুষের ধারণ ক্ষমতার উপর। যখন লিখিত ভাষা আবিষ্কার হলো এটির খুব বিস্তার হয়ে গেল।

মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার সক্রিয় হতে থাকল এবং তার পরিবহন খুব সহজ হলো। ব্যক্তিকে তার জ্ঞান নিয়ে যেতে হচ্ছে না, একটি বই নিয়ে গেলেই হচ্ছে। এটি বিপ্লব নিয়ে এলো।’

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি সার্বজনীন কারিকুলাম করা গেলে সুবিধা হবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘বেশির ভাগ দেশ যারা ভালো করছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ইউনিভার্সাল ইউনিফায়েড (সার্বজনীন ঐক্যবদ্ধতা) রয়েছে।

আমরা যখন স্বাধীন হই তখন আমাদেরও এমন একটি স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অর্ধশতাধিক বছর পরে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় ১৪টি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। ফলে আমাদের সেই প্রাথমিক একীভূতকরণের স্বপ্ন এখন স্বপ্নাতীত। ফলাফল স্বরূপ আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই বিচ্ছিন্নতার সূচনা তৈরি হচ্ছে। ঐক্যের ভিত্তি তৈরি হচ্ছে না।

,

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের প্রথম চ্যালেঞ্জে, ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারকে উৎখাত করেছে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জে, দেশ গড়া এবং সমাজ রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান রয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার কমিশন গঠন করে সংস্কার চলছে। জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ ও নানা ক্ষেত্রে সংস্কার দেখতে পাচ্ছি। রাজনৈতিক ও সমাজের রূপান্তরের যে লড়াই সেই লড়াই শুধু আত্মাহুতি দিলেই চলবে না। এই লড়াইয়ে জিততে হলে আমাদের দরকার সততা, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিভিত্তিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। এরকম একটি পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন হলো, গণঅভ্যুত্থান উত্তর বাংলাদেশের দার্শনিক ভিত্তি কী হবে?

গণঅভ্যুত্থানের সময় দল-মত নির্বিশেষে সবাই একত্র হয়ে লড়াই করেছিলাম। মৌলিক অধিকারের যে জায়গাগুলোতে আক্রান্ত ছিলাম সেই জায়গা থেকে গণঅভ্যুত্থানে একটি অর্গানিক ডাইমেনশন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পরে দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন দল, মত ও পতাকার মতাদর্শগত বিভাজন তৈরি হয়েছে। মানুষের মতাদর্শিক ভেদ থাকবেই সেটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মতাদর্শিক ভেদগুলো একান্তবাদের দিকে যায়। মৌলিক অধিকারগত চাহিদা এবং মতাদর্শের সমন্বয় হলে রাষ্ট্র সংস্কার সফল হবে বলে আমি মনে করি।

কিন্তু বাস্তবিকভাবে দেখি, যারা সরকার গঠন করে তারা একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই উপনিবেশটি হয় বেশিরভাগ মানুষের দেহের ওপরে। অর্থাৎ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত যারা থাকবে তাদের খাবার কম থাকবে, বাসস্থান থাকবে না, গুম করা হবে, আটক করা হবে, তাদের দেহ কখনো নিরাপদ থাকবে না। এটাই আধুনিক গণতন্ত্রের বড় সংকট। যারা রাষ্ট্রের শাসক হয়ে ওঠেন তারা কোনো এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় এই উপনিবেশটা স্থাপন করেন। তারা টার্গেট কিছু মানুষের ওপরে উপনিবেশটা স্থাপন করেন।

আজকে মজুরেরা সড়ক অবরোধ করে কারখানাগুলোতে আন্দোলন করছেন। এই মজুরেরাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মাহুতি দিয়েছেন। তারপরেও তারা মাসিক বেতন পাচ্ছেন না। আগের ধারাবাহিকতা এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে চলমান দেখছি। রাষ্ট্র গঠনের আরেকটি সংকট হচ্ছে সার্বভৌমত্বের প্যারাডক্স। যারা সার্বভৌমত্ব বা ক্ষমতা লাভ করেন তারা নিজেরাই বর্বর হয়ে ওঠেন। দেশ গঠনের জন্য আমরা যাদের ওপর নির্ভর করি তারা নিজেরা যখন উপনিবেশ তৈরি করে এবং বর্বর হয়ে ওঠেন তখন আমাদেরকে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় করতে হয়।

আমাদের বর্তমান প্রক্রিয়াধীন রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সার্বভৌমত্বের সংকট থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়। দেশের ভেতরে যদি সমাজ রূপান্তর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষকে মানুষে রুপান্তর করা যায় তাহলে আমরা হয়ত বিরোধী দলের কাউকে পিটিয়ে মারতে দেখব না। কিংবা যত বড় শত্রুই হোক, তার বিচার পাওয়ার অধিকার থাকবে।’